শ্রীহর্ষ

কালিদাসোত্তর কালে প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে রচিত মহাকাব্যসমূহের মধ্যে মহাকবি শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকবি শ্রীহর্ষ এবং নাট্যকার শ্রীহর্ষ আলাদা ব্যক্তি। প্রথম জন দ্বাদশ শতকের কবি, দ্বিতীয় জন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের নাট্যকার এবং পুষ্যভূতি বংশোদ্ভব সম্রাট হর্ষবর্ধন। 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের প্রতিটি

Scanned with CamScanner

সর্গের শেষে শ্রীহর্ষ তাঁর পিতামাতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।"

কবির পিতার নাম শ্রীহীর, যিনি কবিগণের মুকুটের অলংকারের হীরকতুল্য এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। কান্যকুব্জেশ্বর কবিকে দুটি তাম্বুল এবং কবি-সার্বভৌমের আসন দান করে যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রীহর্ষ এই কান্যকুব্জাধিপতির কোন নাম উল্লেখ করেন নি। রাজশেখর রচিত 'প্রবন্ধকোষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে পূর্ববারাণসীর রাজা জয়ন্তচন্দ্রের রাজসভার অন্যতম সভাসদ ছিলেন কবির পিতা শ্রীহীর। সেখানে প্রতিপক্ষ এক পণ্ডিতের কাছে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে শ্রীহীর সেই পণ্ডিতম্মন্য প্রতিপক্ষ পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করার জন্য শ্রীহর্ষকে নির্দেশ দেন। শ্রীহর্ষ দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিদ্যাভ্যাস এবং চিন্তামণি মন্ত্রের আরাধনা করে অলৌকিক বাগ্‌বিভব লাভ করেন এবং জয়চন্দ্রের সভায় সেই পিতৃবৈরী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি জয়ন্ত চন্দ্রের বা জয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এই জয়ন্তচন্দ্র ১১৬৩ থেকে ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন একসময় সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজশেখরের মতে রাজা জয়ন্তচন্দ্র ছিলেন কুমারপালের (১১৪৩-১১৭৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক। ১১৬৩ থেকে ১১৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি রাজ্যশাসন করেন। এর থেকে অনুমিত হয় যে, শ্রীহর্ষ ১১৬৩-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় 'নৈষধচরিত' মহাকাব্য রচনা করেন। এই অভিমত ব্যুহলারের।[১]

আমরা অন্যভাবেও শ্রীহর্ষের কাল নির্ণয় করতে পারি। উদয়ন দশম শতাব্দীতে 'লক্ষণাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীহর্ষ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক দার্শনিক গ্রন্থের বহুস্থলে উদয়নের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। শ্রীহর্ষের এই গ্রন্থে মহিমভট্ট এবং তাঁর রচিত 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১০২০ খ্রীঃ থেকে ১০৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত কালকে মহিমভট্টের স্থিতিকালরূপে ধরা হয়। সুতরাং মহাকবি শ্রীহর্ষ মহিমভট্টের পরেই জন্মেছেন। হেমচন্দ্রাচার্য রচিত 'অনেকার্থসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের 'অনেকার্থকৈরবাকরকৌমুদী' টীকায় সর্বপ্রথম নৈষধচরিত মহাকাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। হেমচন্দ্রের শিষ্য পণ্ডিত মহেন্দ্রসূরি গুরুর মৃত্যুর পর এই টীকা রচনা করেন। ১০৮৮ খ্রীঃ থেকে ১১৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত হেমচন্দ্রের স্থিতিকাল। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ১২০০ খ্রীঃ স্বরচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি'-তে শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের বিভিন্ন যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। এই সকল তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ১০২০ খ্রীঃ থেকে ১১৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত সুবিস্তৃত একশত বছর সময়ই হল শ্রীহর্ষের স্থিতিকাল। তবে এই মহাকবির প্রতিভার সমধিক বিকাশ ঘটেছিল ১১২৫ থেকে ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

Scanned with CamScanner

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' এবং 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' ছাড়া অন্য কোন রচনা এখনও পাওয়া যায় নি। তবে নৈষধচরিতের সর্গান্ত শ্লোকে শ্রীহর্ষ নিজের কয়েকটি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। তার থেকে জানা যায় যে—স্থৈর্যবিচারপ্রকরণ, বিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি, অর্ণববর্ণন, ছিন্দপ্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, নবসাহসাঙ্কচরিত প্রভৃতি গ্রন্থও শ্রীহর্ষের লেখনী-প্রসূত।

'নৈষধচরিত' বাইশটি সর্গে রচিত শৃঙ্গার-রসোজ্জ্বল মহাকাব্য। মহাভারতের বনপর্বে (অধ্যায়, ৪৫—৬৫) বর্ণিত নলদময়ন্তীর আখ্যানভাগ এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়। নলের দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনীকে বাদ দিয়ে নলদময়ন্তীর সম্ভোগচিত্র এবং নলের ধর্মপ্রাণতা বর্ণনা করে কবি তাঁর মহাকাব্য সমাপ্ত করেছেন। নল-দময়ন্তীর পারস্পরিক অনুরাগ, নলের দূতরূপে রাজহংসের কুণ্ডিননগরে গমন, দময়ন্তীর মনোভাব জেনে রাজহংসের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা প্রথম তিনটি সর্গে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর কন্যান্তঃপুরে বিরহকাতরা দময়ন্তীর অবস্থা দেখে বিদর্ভরাজ ভীম স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নারদের মুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম স্বয়ম্বর সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দূতরূপে তাঁরা নলকে প্রেরণ করেন দময়ন্তীর কাছে। স্বয়ম্বর সভায় উপবিষ্ট পাঁচজন নলকে দেখে দময়ন্তী বিভ্রান্ত হন, দময়ন্তীর স্তুতিতে প্রীত দেবতারা দেবভাব প্রকাশ করলে বিদর্ভরাজকন্যা তাঁর হৃদয়েশ্বরকে চিনতে পারেন। নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে নল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর নায়ক-নায়িকার সম্ভোগের বর্ণনা এবং নলের ধর্মপ্রাণতার বর্ণনায় কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে।

সহজাত প্রতিভার সঙ্গে ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সমন্বয়ে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভারবি যে নতুন শৈলী প্রবর্তন করেন, তার সার্থক উত্তরসূরী এবং অলংকৃত মহাকাব্য রচয়িতাদের শেষ স্তম্ভ হলেন মহাকবি শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। প্রাজ্ঞম্মন্য কোন ব্যক্তি এই কাব্যপাঠে যাতে ছেলেখেলার সুযোগ না পায়, তাই কবি তাঁর রচনার বহুস্থলে জটিল গ্রন্থিবিন্যাস করেছেন—

"গ্রন্থগ্রন্থিরিহ ক্বচিৎ ক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতি মাস্মিন্ খলঃ খেলতু।"

এই গ্রন্থি হল দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার জটিল তত্ত্ব। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত এবং দর্শনের বিভিন্ন শাখার ন্যায় অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতেও কবির অনায়াস দক্ষতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচনায়। প্রকৃতি-প্রেমিক কবির বর্ণনায় প্রকৃতি কখনো স্ব-স্বরূপে, কখনো উদ্দীপন বিভাবরূপে, কোথাও প্রতীকরূপে, কোথাও আবার চেতনবানরূপে চিত্রিত হয়েছে। শ্রীহর্ষের রচনাশৈলীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পদলালিত্য। তাই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত অছে—"নৈষধে পদলালিত্যম্।" কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের গীতিধর্মিতাই নৈষধচরিতের পদলালিত্যের মূল রহস্য। বর্ণনার বৈশিষ্ট্যে, আকৃতির বিপুলতায়,

Scanned with CamScanner

রসপরিবেশনের উৎকর্ষে, অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে, বৈদুষ্যগত মহত্ত্বে, প্রকৃতিচিত্রণের স্বতন্ত্রতায় এবং চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্বসূরী ভারবি ও মাঘকে অতিক্রম করেছেন। 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে—"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।"

শিবস্বামীর 'কপ্ফিনাভ্যুদয়' এবং মঙ্ককের 'শ্রীকণ্ঠচরিত' ক্ষয়িষ্ণু যুগের মহাকাব্য। প্রথমটির উপজীব্য বিষয় দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্ফিনের কাহিনী, দ্বিতীয়টির উপজীব্য বিষয় শিবকর্তৃক ত্রিপুরাসুরের বিনাশের পৌরাণিক বৃত্তান্ত। 'কপ্ফিনাভ্যুদয়' কুড়িটি সর্গে এবং 'শ্রীকণ্ঠচরিত' পঁচিশ সর্গে নিবদ্ধ। এছাড়াও হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত', চক্রকবির 'জানকী পরিণয়', দেবপ্রভ সূরির 'পাণ্ডবচরিত', 'কৃষ্ণানন্দের 'সহৃদয়ানন্দ', সোমেশ্বরের 'সুরথোৎসব' প্রভৃতি কাব্য সংস্কৃত অলংকৃত মহাকাব্যের শাখাকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

Scanned with CamScanner